ISSN 0976-9463
Volume 28 • Issue 1 • Number 49

তরুএকলব্য ৪৯

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities
কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

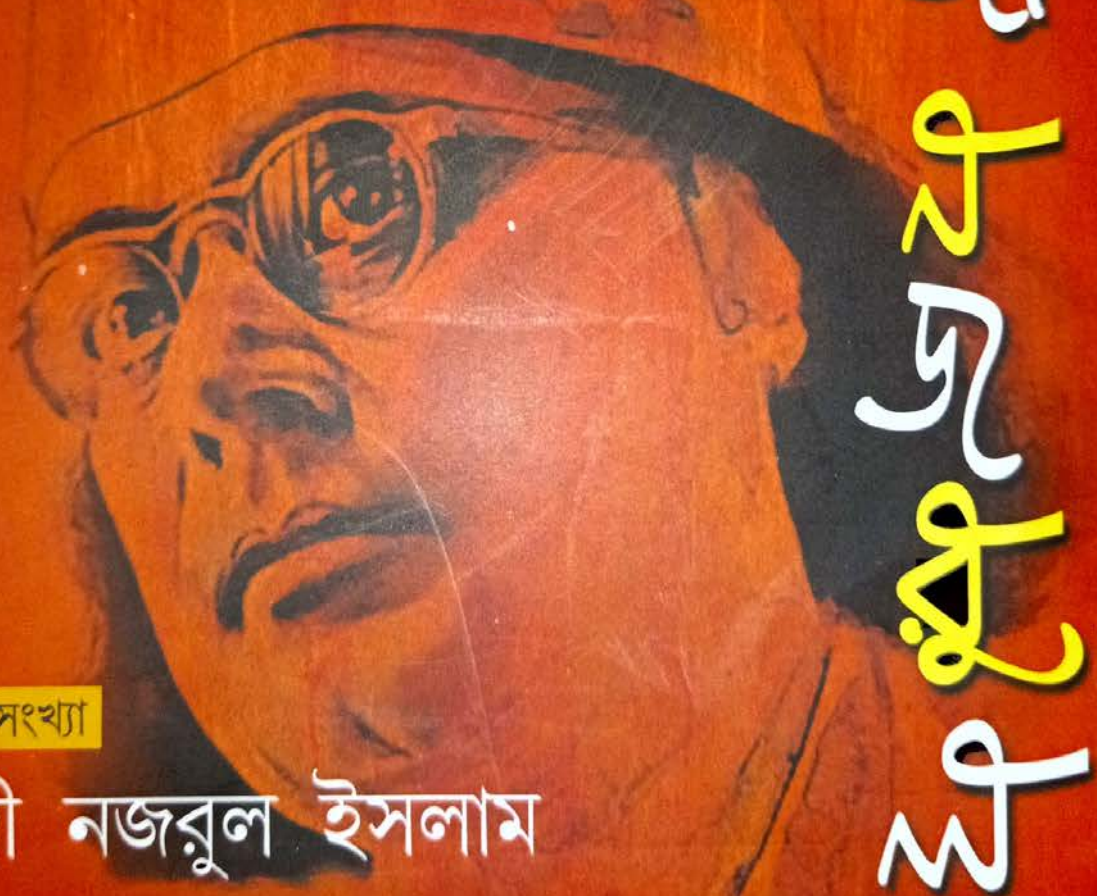

বিশেষ সংখ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

সম্পাদনায়
তপন মন্ডল || শামস্ আল্‌দীন

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

ISSN 0976-9463

তবু একলব্য

৪৯

Volume 28 ● Issue 1 ● Number 49

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল ‖ শামস্ আল্‌দীন

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

49

Tabu Ekalavya

An International Peer-reviewed Refereed Research
Journal on Arts & Humanities
Volume 28, Issue 1
Number 49
Published : January 2022
First Edition : January 2023
ISSN : 0976-9463
ISBN : 978-93-92110-22-1

Kaji Nazrul Islam
Vol. II

Tabu Ekalavya

Chief Advisor : Swami Shastrajnananda
Selina Hossin
Ramkumar Mukhopadhyay
Soma Bandyopadhyay
Sadhan Chattopadhyay
Ashis Chattopadhyay
President : Biplab Majee
Vice-President : Tapan Mandal
Executive Editor : Sushil Saha
Editor : Debarati Mallik
Working Editor : Tapas Pal
Editor-in-Chief : Dipankar Mallik
e-mail : tabuekalavya@gmail.com
Website : www.tabuekalavya.in
facebook : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
group : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৩৯৯ টাকা

সূ|চি|প|ত্র

ঐতিহ্য ও পরম্পরায় নজরুল ______________

বাংলা ভাষা ও নজরুল ইসলাম ‖ আবদুল কাদির

১

নজরুল-সাহিত্যে নূতন ধারা ‖ বেগম সুফিয়া কামাল

৫

জাতীয় জাগরণে নজরুল ______________

নব যুগের অগ্রপথিক নজরুল ‖ আবুল কালাম শামসুদ্দীন

৮

নজরুলের কবিতায় স্বদেশ ভাবনা ‖ পীযূষকান্তি হালদার

১২

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সৃজন ও সাহিত্যচেতনায় সাম্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ‖ মহিতোষ গায়েন

১৬

নজরুল : মৌলিকত্বের আলোকে ______________

মানুষের কবি নজরুল ‖ কাজী মোতাহার হোসেন

২৫

নজরুলের কবি-প্রতিভা ‖ মুহম্মদ এনামুল হক

২৮

নজরুল-কাব্যে মানবতা ‖ মুহম্মদ আবদুল হাই

৩৩

গীতিকার নজরুল ‖ আব্বাসউদ্দীন আহমদ

৩৭

বাংলা কাব্যে নতুন ধারা ও নজরুল ‖ মুহম্মদ আবদুল হাই
৪৬

কবি নজরুল : নিপীড়িতজনের মন-মথনের বাণীকার ‖ অরূপ কুমার দাস
৫০

কাজী নজরুল : এক নীড়হারা পাখি ‖ বাঁধন সেনগুপ্ত
৫৯

নজরুল : মৌলিকত্বের আলোকে ‖ সোহারাব হোসেন
৬৫

নজরুলের চোখে মানবতাবাদ ‖ আশিস রায়
৮৩

দুখুমিঞা থেকে নজরুল : যন্ত্রণার ইতিকথা ‖ কল্যাণ মুখার্জী
৯০

নজরুলের রচনায় কৃষিভাবনা ‖ সুদেষ্ণা কোনার
৯৮

নজরুল : প্রসঙ্গ আধুনিকতা ‖ মিষ্টু রায় সামন্ত
১০৩

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ‖ পায়েল মুখার্জী
১১২

কবি নজরুল : পুনর্বিচার

'অগ্নিবীণা' : কাব্যপাঠের ভূমিকা ‖ বিশ্বজিৎ ঘোষ
১১৮

নজরুলের রোমান্টিক মানস : 'চক্রবাক' ‖ বিশ্বজিৎ ঘোষ
১৩০

নজরুল : একালের পাঠকের উপলব্ধিতে ‖ মুন্সী মহম্মদ ইউনুস
১৩৫

নজরুলের কাব্যে প্রকৃতি ‖ প্রীতম মণ্ডল
১৪১

নজরুলের কাব্যসংগীত : বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ ‖ নীলাংশু অধিকারী
১৪৬

নজরুলের চোখে মানবতাবাদ

আশিস রায়

চারিদিকে শুধু 'নেই'-এর হাহাকার। হতাশায় আবৃত। জীবনানন্দের 'বোধ' এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। না পাওয়ার মাঝে মানবতাও এখন অসুস্থ। তা না হলে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও করোনা মহামারির সময় মানুষকে প্রশ্ন করতে হয়, মহাশয় আপনার মানবতা আছে? উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে না। হাজারো জিনিস মাপার যন্ত্র থাকলেও মানবতা মাপার যন্ত্র এখনও আবিষ্কার হয়নি। একদিন নিশ্চই পাওয়া যাবে, বিজ্ঞানের উপর ভরসা রেখে। ইট, কাঠ, পাথর দিয়ে যদি কারও মন তৈরি না হয়, তাহলে নিশ্চিত আমরা মানবতার দেখা পাব। এত হতাশার মধ্যেও আলোর দেখা পাওয়া যায়। মানবতাহীন সমাজের মাঝে মানবিকমুখ আলোর রেখা দেখান। সাহিত্যিকরা এই পথ তৈরি করে দিয়েছেন বহু দিন আগে—

> আজকাল যে সাম্যের বাণী লোকের মুখে মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তাঁর প্রথম উদ্যোক্তা। রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে চলেননি, তাঁর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি—তা থেকে বের করেছেন সুর ঝংকার এবং সেটাই তো কবির কাজ; এখানকার রাজনৈতিক আড্ডায় শুধু এইজন্য তাঁর সম্মান হতে পারতো, সেটা হয়নি এই কারণে যে, প্রগতিশীল পরিভাষায় নজরুলের কবিতা রোমান্টিক। বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা —এ সমস্ত জিনিষকে যারা রোমান্টিক বলে এক পাশে সরিয়ে রাখেন, তাঁদের পক্ষে সাহিত্য-চর্চা নিতান্তই অবৈধ।[১]

নজরুলের কবিতার মধ্যে সমাজ সচেতনতা, গণতান্ত্রিক চেতনা, সাম্যবাদী প্রত্যয় বারবার উঠে এসেছে। শ্রমজীবী মানুষের শোষণ বঞ্চনা তিনি কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। ধর্মের কুসংস্কার থেকে তিনি মানবতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। প্রকৃত জীবনবাদী কবিরাই মানবদরদি হয়ে উঠতে পারেন। তাঁর কাব্যের প্রধান উপাদান ছিল সমকালীন জীবন ও জগৎ। 'লেটো' দলে যুক্ত হওয়ার পর কবির মধ্যে এই উপাদানের সন্ধান পেয়েছিলেন। সমাজের উচ্চ

শিখরে বসে থাকা বিত্তবান মানুষদের প্রতি প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী মন তাঁর শিশু বয়স থেকেই তৈরি হয়েছিল। শৈশবেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সমাজের ভোগবাদী মানুষের শোষণের নানা প্রকারের রূপ। শৈশবের জীবনযন্ত্রণাই তাঁকে বাস্তববাদী হতে শিখিয়েছিল। সেজন্য তাঁর কবিতার ভাষা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে ধরা দেয়। বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী কবি মানুষের মনে চেতনার জাগ্রত করতে চান। মানুষকে মানুষের ধর্ম মনে করিয়ে দেন। শেখান মানবতার পাঠ—

> এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান—ঐ শ্মশানভূমিতে-শোনো শোনো তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ-পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই।[২]

আজকের দিনে চারিপাশে যে জাতিগত বৈরিতা, তা কবি পচ্ছন্দ করতেন না। অথচ আমরা এই অসহনীয় পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেরা কেমন মানিয়ে নিয়েছি। শুধুমাত্র নিজের টুকুতেই সন্তুষ্ট। বিপদের দিনে পাশে থাকা তো দূর, আরও বিপদে কীভাবে ফেলা যায় তার শত চেষ্টায় আমরা ন্যস্ত থাকি। বিশুদ্ধ অক্সিজেন আর মনের মধ্যে খেলা করে না। বুক ভরে শ্বাস নিতে ভুলে গেছি। নিস্তব্ধে প্রশ্বাস ছাড়ি, যেন অন্যরা তাঁর অস্তিত্ব না পায়। দুস্টু মস্তিষ্কের কার্য চলতে থাকে। কবি পচ্ছন্দ করতেন না এই অসাধু মানুষদের। তিনি বলেছেন—

> বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!/দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।/রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,/তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,/বড় কথা বড় ভাব আসে নাকো মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!/অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছো সুখে![৩]

নিজের জীবন দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মানবসমাজে শোষণ আর বঞ্চনা কতটা যন্ত্রণাদায়ক। সব থেকে বেশি কষ্টের ছিল সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষের। এই সাধারণ মানব সমাজের চেতনা জাগ্রত করার জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন। সাম্যবাদী মন্ত্রে তিনি সকলকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। সবার প্রাণে আশার আলো সঞ্চার করে দিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের যন্ত্রণাও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। পরাধীনতার গ্লানি তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মনের মধ্যে ঘৃণার পাহাড় গড়ে উঠল। তারই অভিব্যক্তি ঘটল কবিতার মধ্যে দিয়ে। যুবকদের স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। তাদের বুকে সাহস জোগানোর জন্য কলমের ভাষা হয়ে উঠল আগুনের ফুলকি। সমগ্র জীবনই তিনি চেয়েছেন দলিত, নিপীড়িত মানুষরা স্বপ্ন দেখুন একটু ভালো করে বাঁচার জন্য আর দু'মুঠো ভাতের জন্য। উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ যেন না থাকে। জয় হোক মানবতার। মানুষের গায়ে লেগে থাকুক মাটির গন্ধ। মানুষ যেন তাঁর নিজের সত্তা ভুলে না যায়। আশাভঙ্গ হতে থাকলে যুগযন্ত্রণায় বিদ্ধ কবি বলতে থাকেন—

> পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
> মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
> প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
> যেন লেখা হয় আমার রক্ত—লেখায় তাদের সর্বনাশ![৪]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধ্বংস হয়ে যাওয়াই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কোনো একটা শক্তি সাধারণ মানুষকে শুষে নিঃস্ব করে দেবে সেটা তিনি কখনোই সহ্য করতে পারেননি। কুলি-মজুররা সমাজে চিরদিন উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। বাবু সমাজ তাদেরকে নীচু নজর থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেনি। দুর্বলের প্রতি এই অপমান কবি সহ্য করতে পারতেন না—

এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়ে মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।[৫]

যারা সহ্য করছে তাদেরকেও তিনি একত্রিত হওয়ার কথা বলছেন। লড়াই করতে গেলে সকলে একত্রিত হয়েই জোট বাঁধতে হয়। খেটে খাওয়া কুলি মজুর যেমন সমাজের চালিকা শক্তি ঠিক তেমনই আন্দোলনের প্রথম সারির মুখ হন এই সাধারণ মানুষরা। সাম্যবাদী আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সর্ব ধর্মকে তিনি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন। ধর্ম, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্ত বৈষম্যের ওপরে যেটা বেঁচে থাকে সেটা মানুষ। মানুষই আসল দেবতা। সমাজের গতিতে পরিবর্তন আনতে পারে একত্রিত সম-মনের এবং সম-মানসিকতার মানুষ। সেই শব্দ পাওয়া যায় কবিতার ভাষাতেই—

> আসিতেছে শুভদিন,/দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!/হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,/পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,/তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,/তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;/তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,/তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!/তুমি শুয়ে রবে তেতালার 'পরে, আমরা রহিব নিচে,/অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।[৬]

উঁচুতলাতে বসে থেকে এতদিন যে অবজ্ঞার ভাবনার জাল বুনে চলেছিল নীচুদের প্রতি, আজ তা আর হবে না। নিম্নশ্রেণির মানুষরা তাদের হারানো চেতনা ফিরে পাচ্ছেন। তারা আর উচ্চশ্রেণির কাছে নিজেদেরকে সহজেই বিকিয়ে দেবেন না। তিনি জানেন সাধারণ মানুষ এত সহজে হার মানে না। তাদের মধ্যে আছে প্রবল ইচ্ছা শক্তি। যে-কোনো মুহূর্তে সেটা জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে। 'লাঞ্ছিত' প্রবন্ধে সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন—

> মানুষ চিরকাল মানুষের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহা পশুদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষ একটি চিন্তাশীল পশু। তাহার বুদ্ধি এত প্রবল যে, ইচ্ছা করিলেই সে তাহার ভিতরকার পশুটিকে দুর্দান্ত এবং নির্মম করিয়া তুলিতে পারে।[৭]

চারপাশে ঘটে চলেছে অরাজকতা। উকিল চেষ্টা করে মক্কেলের কাছ থেকে কত টাকা খাওয়া যায়। মহাজনের নজর থাকে দেনাদারের ভিটেমাটির ওপরে। ভদ্রলোক নিজের চাতুরি দেখিয়ে বোকাদেরকে ঠকাতে চায়। কেউ নিজের বুদ্ধি বিক্রি করছে তো আবার কেউ দেশনীতির মেলা খুলে বসে আছে। প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে আছে কে কার মাথা খেতে পারে। খাওয়াটাই এখানে মূল ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবলরা সবসময় ব্যস্ত থাকে দুর্বলকে কেমনভাবে কোন্ উপায়ে বিপদে ফেলে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষের একশো জনের মধ্যে সত্তরজন চাষি। সারাদিন মাঠে কাজ করেও দু'বেলা ভাত জোটাতে তারা সক্ষম হয় না। দু'মুঠো

ভাতের জন্য তাদেরকে মহাজনের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হয়। দুর্ভিক্ষের দিনেও কারো কাছ থেকে কোনও সাহায্য পায় না। উচ্চজাতি মৃত্যুকালেও নিম্নজাতিকে ওপরে উঠতে দিতে চায় না। আজকের এই করোনা মহামারির সময়েও যা আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি। উচ্চশ্রেণি বিপদে পড়লেও নীচুশ্রেণির হাত ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেন। জাতিগত বৈষম্যও সেখানে আরও বড়ো মাত্রায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কবি এই ভেদাভেদ পচ্ছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন মানুষের মাঝে শুধুমাত্র মানবতা বেঁচে থাকুক। কেউ কাউকে পৃথক হিসেবে দেখবে না। সকলেই আমরা সমান। তিনি সেজন্য সাম্যের কথা বলেছেন—

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান
কে তুমি?—পার্সি, জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভিল, গারো?
কনফুসিয়া? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বলো আরো!
বন্ধু যা খুশি হও।[৮]

সাধারণ মানুষের দুঃখ মোচনের মধ্যে দিয়েই মানুষের আসল ধর্মের প্রকাশ। কবি জানতেন প্রত্যেকটি মানুষই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। শুধু তাদের ভিতরের লুকিয়ে থাকা আগুনটাকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। মনের আত্মশুদ্ধি হলেই তারা নিজেরাই কী করতে হবে বুঝে যাবে। নব্য দৃষ্টি দিয়েই তাদের ঐক্য সাধনের চেষ্টা করেছেন তিনি। মানবদরদি কবি পরাধীন ভারতবর্ষের যন্ত্রণাকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি। সেজন্য শৃঙ্খলবন্ধের সঙ্গে করে উঠতে পারেননি কোনো প্রকার আপস। সেজন্য তিনি ফিরে এসেছেন সব হারানো মানুষের মাঝে।

এখন চারিদিকে বেশ কোলাহল চলছে। সকলে দেশের মঙ্গলসাধনের জন্য জীবনপাত করতে চায়। যতটা না করতে চাইছে তাঁর থেকে বেশি নিজের প্রচার করছে। আমরা বাইরের খোসা নিয়ে যখন টানাটানি করি তখন আমাদের আত্মতৃপ্তি বেড়েই চলে। শেষে নিজেরাই লাঠালাঠি করে রক্তপাত করি। আর শত্রু হাসাই। বাঙালির ভাবোচ্ছ্বাস আছে, কর্মক্ষমতা আছে কিন্তু যেটা নেই সেটা হল জ্ঞান আর জিজ্ঞাসা। আর জিজ্ঞাসা না থাকলে ভেদাভেদের কারণ জানা যায় না। কবি বলছেন নিরাশায় মুষড়ে পড়ে থাকার সময় নয়। সবাইকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাগতে হবে। গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার সময় হয়ে এসেছে। 'আমাদের অন্তরে, বাহিরে, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে মৃত্যুর বিষবীজ ছড়িয়ে আছে—সে করাল কবল থেকে আমাদের রক্ষা পেতেই হবে—আর তার জন্যে সর্বাগ্রে চাই স্বরাজ।'[৯]

চরকা খদ্দরের আন্দোলনে ও প্রচলনে দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর মাধ্যমে কতটা দেশের স্বাধীনতা আসবে সে বিষয়ে তিনি বেশ সন্দিহান। দেশের কাজের জন্য পল্লিগঠন করা প্রয়োজন। মূক মৌনমুখে ভাষা জোগাতে হবে। সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অকুণ্ঠচিত্তে তারা যেন প্রতিবাদ করতে পারে। এই ব্যবস্থা না করা গেলে মুক্তি সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ভদ্রলোকের জটলাতে স্বরাজের পাকা বুনিয়াদ কোনওদিন প্রতিষ্ঠা হবে না। এর ফলে সমগ্র জাতিকে তাদের পূর্ণ অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল রকম অবিচার আর কদাচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর বল থাকতে হবে। ছত্রভঙ্গ

জনশক্তিকে সংঘবদ্ধভাবে চালিত করতে না পারলে অত্যাচারীর দম্ভকে স্তম্ভিত করা যাবে না। 'আজ সেই সাধক ও সিদ্ধ নেতা কোথায়, যিনি এই দীনহীন জীর্ণ মলিন আচণ্ডাল ভারত সন্তানের বিষণ্ণ মুখে হাসির ও তেজের আলো ফুটিয়ে তুলবেন—বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?'[১০] কিন্তু কবি আত্মশক্তিতে বলিয়ান। সব-হারানো মানুষগুলো যেন আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠতে পারে। তারা যেন পরাধীনতার শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পান। তিনি সেই আহ্বান করেছেন—

> বল বীর—/বল উন্নত মম শির!/শির নেহারি আমারই, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!/বল বীর—/বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি/চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি/ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,/খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া/উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!/মম ললাটে রুদ্র ভগবান রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!/বল বীর/আমি চির-উন্নত শির![১১]

ছাত্রসমাজ বা যুবসমাজকে তিনি বীর হিসেবেই দেখতেন। ছাত্ররাই যৌবন-দীপ্ত দৃঢ় আত্মসচেতন। ছাত্ররাই পারবে ভারতবর্ষকে মুক্তির স্বাদ দিতে। কবি তাদের হাতেই দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখেন। সমস্ত বাঁধা ছিন্ন করার ক্ষমতা একমাত্র ছাত্ররাই দেখতে পারে। চির উদ্দাম চঞ্চল বালকদের নিয়েই কবিতা লিখলেন। ছাত্রসমাজকে বৃহত্তর সমাজের মাঝে এসে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারাই হয়ে উঠল ভাঙা গড়ার কারিগর। কবির ভাষায়—

> আমরা শক্তি আমরা বল/আমরা ছাত্রদল।/মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান/ঊর্ধে বিমান ঝড়-বাদল।/আমরা ছাত্রদল॥/মোদের আঁধার রাতে বাঁধার পথে/যাত্রা নাঙ্গা পায়,/আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই/বিষম চলার ঘায়!/যুগে যুগে রক্তে মোদের/সিক্ত হল পৃথ্বীতল॥/আমরা ছাত্রদল॥[১২]

কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। রক্তক্ষয়ী এই আন্দোলন মানবতার ক্ষেত্রে চরম অবমাননা। জাতির এই ভেদাভেদকে তিনি মেনে নিতে পারতেন না। কবি অসহায়বোধ করেন মানুষে মানুষের ভেদাভেদ দেখে। তিনি লক্ষ করেছেন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কেউ পায়জামা-শেরওয়ানি-টুপি এমনকী লুঙ্গি পরলেও কেউ কিছু বলে না। তাদেরকে নিয়ে কেউ বিদ্রুপও করে না। তাদের পোশাকের নাম হয়ে যায় 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু এই পোশাকগুলো মুসলিমরা পরলেই নাম হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব'। মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা চালু হলে কে জিতবে বলা মুশকিল কিন্তু এসব নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা চলতেই থাকে। কবি নিজেই এসব পোশাক পরিত্যাগ করেছেন তবুও তিনি বিদ্রুপের হাত থেকে নিস্তার পান না। শুধুমাত্র পোশাকেই নয়, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। কবি জানিয়ে দিয়েছেন আরবি, ফারসি ব্যবহার কবিতায় তিনি শুধুমাত্র একাই করেননি। তাঁরও বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া কবিকে বিচলিত এবং রুষ্ট করে দেয়। হিন্দু-মুসলিম বলে কিছু হয় না। সকলে মানুষ তাই কবি লিখেছেন—

> অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
> কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
> হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
> কাণ্ডারী। বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার![১৩]

জাতির ঐক্য দেশের জন্য মঙ্গল। কিন্তু সে পথে বাঁধা অনেক। সেজন্য কবি চান সারা ভারতজুড়ে একটা বিরাট ওলট-পালট। এই পোড়া দেশে কাব্যকুঞ্জের মধু গুঞ্জ শোভা পায় না। নিলর্জ্জের মতো যারা অভিনয় করে তাদের দেখে নিদারুণ উপহাসের মতো মনে হয়। ভারতের জীবনের অণু-পরমাণু আজ পচা-গলা বিষের বাসা হয়ে উঠেছে। পরিপূর্ণ সৃষ্টির জন্য বিপুল ধ্বংসের প্রয়োজন। এই সত্যযজ্ঞে সকল মিথ্যা অত্যাচারকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে না পারলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। পুরাতন জীর্ণ জরা ভারত ভস্মে আচ্ছাদিত না হলে তাতে দেবোপম জীবনের অভিনব সৃষ্টি গড়ে উঠবে না। জীবন ভরাট হলে থাকবে জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ, সতেজ গতি ও অভিব্যক্তি। থাকবে না কোনো জড়তা বা আড়ষ্টতা। আজ পথের বাঁধা পাষাণ অটল হিমাচলের মতো দৃঢ় হলেও মানুষের পদাঘাতে তা চক্ষের নিমেষে চূর্ণ হয়ে যাবে। সমাজধর্মের অহংকারধারী উচ্চশ্রেণির উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে। সত্য ও মুক্তির জয়পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে এমন কোনো অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিতে পারবে না। আজকের দিনে ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে প্রায় ষোলোআনা ঘুণ ধরে গিয়েছে। এই পচা-গলা সমাজব্যবস্থাকে বদলে দিতে পারে মানুষরা। সবার ওপরে তিনি এই 'মানুষ'কে বড়ো বলে ঘোষণা করেছেন। 'মানুষ' কবিতায় তিনি দেশ-কালের পার্থক্য অস্বীকার করে 'এক ধর্ম এক জাতি' এই মতকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ধর্মীয় প্রচারকদের তিনি সতর্কবাণী মধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন মানুষের মাঝেই আছে দেবতা—

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
পূজারী দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়।
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, দ্বার খোলো বাবা, খাইনিকো সাত দিন।
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তাঁর ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারি ফুকারি কয়,
ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়![১৪]

কবি অকপট সত্যকেই বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি কোনো চতুরতার আশ্রয় নেননি। জাতি, ধর্ম, পাপ এগুলি সবটাই তাঁর কাছে শুধুমাত্র আপেক্ষিক। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানবিক মানুষ তাঁর কাছে অনেক শ্রদ্ধার। তিনি সেটাই বলার চেষ্টা করেছেন। একইরকমভাবে তিনি নারীকে আলাদাভাবে দেখতে চাননি। একজন পুরুষ প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন আর একজন নারীর কোনো ক্ষমতাই নেই সেটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। নারীকেই তিনি সমান শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। নতুন সমাজ গড়ার জন্য, সতেজ, প্রাণবন্ত নারী এবং পুরুষ সকলকেই তিনি এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। নারীকেও সমস্ত রকম বন্ধন থেকে যেনো

মুক্তি দেওয়া হয়। নারীরা এগিয়ে না এলে সে সমাজ কোনোদিন এগিয়ে যেতে পারে না। নারীকে সমাজের পঙ্কিল চিন্তা চেতনার আবর্ত থেকে মুক্ত করে তিনি পুরুষের সমান মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। তাঁর 'নারী' কবিতার মধ্যে দিয়ে যেমন মানবতাবাদের পরিচয় পাওয়া যায় একইরকমভাবে সাম্যবাদী মনোভাবও প্রকট হয়ে উঠেছে—

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তাঁর করিয়াছে নারী, অর্ধেক তাঁর নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তাঁর আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।[১৫]

মানবতাবাদ আর সাম্যবাদ তাঁর কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। একজন মুক্ত মনের কবির হাত থেকেই এমন কবিতার জন্ম হয়। আধুনিক মন তাকে অনেক বেশি উদার করে দিয়েছিল। দেশকালের ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনা। মানুষের প্রতি যখন অন্যায় অবিচার হয়েছে তখন তিনি চুপ থাকতে পারেননি। ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়েছেন বারে বারে। মানুষের মাঝেই তিনি ভালোবাসার অমোঘ স্বাদ খুঁজে পেয়েছেন। নারী-পুরুষ সকলকে সমান মর্যাদায় আসীন করতে চেয়েছেন। দলিত শ্রেণির মানুষের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। থাকতে চেয়েছেন মাটির কাছাকাছি মানুষের পাশে। তাদের সঙ্গে। সুন্দর এই পৃথিবীকে আরও সুন্দর মনের এবং মানের করে তুলতে চেয়েছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. বুদ্ধদেব বসু : 'কবিতা', নজরুল সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫১
২. কাজী নজরুল ইসলাম : 'নজরুল রচনাবলী', জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৭২
৩. তদেব : দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১১, পৃ. ১৩০
৪. তদেব : পৃ. ১৩১
৫. তদেব : পৃ. ৯৪
৬. তদেব : পৃ. ৯৪
৭. কাজী নজরুল ইসলাম : 'নজরুল রচনাবলী', জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩
৮. উৎস-২, পৃ. ৭৯
৯. উৎস-৭, পৃ. ১১
১০. তদেব : পৃ. ১৩
১১. উৎস-১, পৃ. ৭
১২. উৎস-২, পৃ. ১২০
১৩. তদেব : পৃ. ১২১
১৪. তদেব : পৃ. ৮১
১৫. তদেব : পৃ. ৮৯